HIST. HONS. SEM-II

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (খ্রী: পূ: ৩২৫ - খ্রী: পূ: ১৭৫)

[কৃষি, সেচ, শিল্প - বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা, নগরায়ন]

Scanned with CamScanner

ও রাজনৈতিক আধিপত্য অপ্রতিহত হয়ে দেখা দেয়। আগ্রাসী নীতির দ্বারা একটি রাজশক্তির সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে উচ্চারিত, তার বাস্তবরূপ দেখা দেয় খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন প্রশ্নাতীত। গ্রীক লেখক প্লুটার্ক ও জস্টিন জানিয়েছেন যে সান্ড্রোকোট্টস বা চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতের উপর ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। তবে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির আরও স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে অশোকের লেখমালায়। যেহেতু অশোকের অভিলেখগুলি বেশীরভাগই প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথা আলোচনা করে, সেহেতু মানতে বাধা নেই যে অশোকের লেখমালা যে যে অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে, সেই সেই অঞ্চলে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। অশোকের অনুশাসনগুলির প্রাপ্তিস্থানগুলি একটি মানচিত্রে সাজালে বোঝা যাবে উত্তরে আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণে কর্ণাটকের উত্তরাংশ পর্যন্ত ও পশ্চিমে কাথিয়াওয়াড় থেকে পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত এক বিশাল ভূভাগ জুড়ে মৌর্য সাম্রাজ্য গঠিত হয়। সুদূর দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা, আসাম ও অরুণাচল প্রদেশ বাদ দিলে প্রায় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশেই মৌর্য শাসনাধীনে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অশোক তাঁর লেখমালায় এই সাম্রাজ্যকে 'বিজিত' বা 'রাজবিষয়' নামে অভিহিত করেছেন। মৌর্যদের সামরিক সাফল্যই ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান উপাদান। কলিঙ্গ অঞ্চল ছাড়া অশোক যেহেতু অন্য কোনও ভূখণ্ডে আর কোনও যুদ্ধ করেন নি, অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় মৌর্য সাম্রাজ্য কার্যত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলেই তার বিশাল আয়তন পরিগ্রহ করে। জস্টিনের বর্ণনায় জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ছয় লক্ষ যোদ্ধা ; অশোকের ত্রয়োদশ গিরিশাসনে কলিঙ্গ যুদ্ধের যে ভয়াবহ ছবি দেওয়া আছে তা থেকেও বোঝা যায় মৌর্যরা এক অত্যন্ত দক্ষ ও বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। আবার মৌর্য সাম্রাজ্য যে প্রায় একশ চল্লিশ বছর (খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-১৮৭) ধরে এক সর্বভারতীয় শক্তি হিসেবে টিকে ছিল তার জন্য কেবলমাত্র সামরিক বাহিনীর দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না। বিশাল ও স্থায়ী সেনাবাহিনীর পাশাপাশি এক বৃহদায়তন প্রশাসন তথা বহুসংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ না করলে এত বড় ভূখণ্ডকে সুসংহত রাখাই দুষ্কর ছিল। এই প্রথম ভারতীয় ইতিহাসে একটি প্রকৃত সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উদ্ভব দেখা গেল। উপরের কথাগুলি বলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ও বহু সংখ্যক রাজকর্মচারীকে পোষণ করতে গেলে শাসকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ থাকা অবশ্যম্ভাবী। এত বড় রাজনৈতিক আধিপত্য আগে দেখা যায়নি, তাই সমপরিমাণ সম্পদের প্রয়োজনীয়তাও ছিল অভূতপূর্ব। সম্পদ সংগ্রহের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থার উদ্ভব প্রাক্ ৩২৫ খ্রীঃ পূঃ-এই ঘটেছে ; কিন্তু কেবলমাত্র প্রজার কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে সামরিক ও প্রশাসনিক খাতে ব্যয় মেটানো সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয় না। ফলে মৌর্যরা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সরাসরি রাষ্ট্রীয় তদারকি, উপস্থিতি ও উদ্যোগের নীতি গ্রহণ করেন। ভারতীয়

Scanned with CamScanner

অর্থনীতির ইতিহাসে এটি এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে চিত্র আগে দেওয়া হয়েছে, তাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই উপস্থিতি দেখা যায়; রাষ্ট্র মূলত প্রজার জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অবশ্যই আগ্রহী ছিল ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণে পিছপা হত না, কিন্তু অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কোনও নিদর্শন জানা নেই। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের শেষ দিকে যেমন প্রকৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, তেমনই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় রাষ্ট্রের ভূমিকা রীতিমত বদলে গেল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা ও তার ফলে যে অভিনব অবস্থা জন্ম নিল, তা-ই এই অধ্যায়ে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের শেষপাদ থেকে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা সম্যকভাবে বোঝার জন্য অবশ্য খুব বেশী নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তবে তথ্যসূত্রগুলি সংখ্যায় অপর্যাপ্ত হলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, অন্ততঃ দুটি তথ্যসূত্র মৌর্য শাসনের সমকালীন : (১) মৌর্য রাজসভায় সেলিউকাসের দ্বারা প্রেরিত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণী ইণ্ডিকা, যা এখন হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত পরবর্তী তিন গ্রীক লেখক, আরিয়ান, স্ট্রাবো ও ডিওডোরাস, তাঁদের নিজ নিজ রচনায় মেগাস্থিনিসের রচনার সারমর্ম দিয়েছেন, উদ্ধৃতিও রেখেছেন। তার থেকে মেগাস্থিনিসের মূল বিবরণীর অন্তত একটি আংশিক চেহারা আন্দাজ করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে পরবর্তী গ্রীক লেখকের করা ইণ্ডিকার সারাংশতে পারস্পরিক ফারাক আছে, এমনকি পরস্পর বিরোধিতাও বিরল নয়। (২) অশোকের অনুশাসন (মুখ্য ও গৌণ গিরিশাসন, মুখ্য ও গৌণ স্তম্ভ শাসন ও রুম্মিনদেই স্তম্ভলেখ) গুলি অশোকের রাজত্বকালে ও তাঁরই প্রত্যক্ষ আদেশে রচিত ও মৌর্য সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশেই প্রচারিত। (৩) এরই সঙ্গে ব্যবহার করা চলে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, যা অনুসন্ধান ও উৎখনন থেকে পাওয়া গিয়েছে। (৪) এবার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। মৌর্য আমলের উপাদান হিসেবে অর্থশাস্ত্র ব্যবহার করা উচিত কি না তা নিয়ে সাম্প্রতিক পণ্ডিতমহলে কিছু সংশয় আছে। আধুনিক পরীক্ষা থেকে মনে হয় যে অর্থশাস্ত্র কোনও একটি নির্দিষ্ট যুগের বা এক নির্দিষ্ট লেখকের রচনা নয়। (অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্য ও চাণক্য যে একই ব্যক্তি ও কৌটিল্য তথা চাণক্য যে চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এই সযত্নলালিত ধারণার পিছনে কোনও প্রমাণ নেই)। এই গ্রন্থের ভিতর অনেকগুলি ভাষাগত স্তর আছে; গ্রন্থটির যে রূপ আমরা জানি, তা আনুমানিক খ্রীঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের আগে নয়। অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল দীর্ঘ সময় ধরে। ফলে অর্থশাস্ত্র যে নিশ্চিতভাবে মৌর্য আমলের সমকালীন রচনা, তা জোর দিয়ে বলা কঠিন। তবে ট্রাউটমান মনে করেন অর্থশাস্ত্রের প্রাচীনতম স্তরটি 'অধ্যক্ষ প্রচার' অংশে পাওয়া যাবে। ঐ অংশটি আঃ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকের রচনা। 'অধ্যক্ষ প্রচার' অংশটির

Scanned with CamScanner

শুধু মৌর্যদের সঙ্গে কালগত সাযুজ্য আছে তাই নয়, এই অংশে এখনকার আলোচনার জন্য দরকারী তথ্যও সন্নিবিষ্ট আছে। ফলে অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্যপ্রমাণ সমকালীন তথ্যসূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে গ্রীক বিবরণে ও অশোকের অনুশাসনে খণ্ডিত হলেও বাস্তব অবস্থার কথা পাওয়া যায়; অন্যদিকে অর্থশাস্ত্রে আদর্শ বা তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে—সেখানে সরাসরি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ নেই। তবে কৌটিল্যের বিধান পুরোপুরি বাস্তববুদ্ধিজাত এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার ক্ষেত্রে আপোষহীনভাবে কঠোর; তাই তার উপযোগিতা নিয়ে সন্দেহ নেই। অর্থশাস্ত্র রচিত হয় যাতে করে ক্ষমতা অভিলাষী শাসক তাঁর ভূখণ্ডে পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেতে পারেন। তাই কৌটিল্য দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন পৃথিবীতে লাভ ও পালনের উপায় যে শাস্ত্রে আলোচিত, তা-ই অর্থশাস্ত্র বলে অভিহিত ('পৃথিব্যাং লাভপালনোপায়শাস্ত্রং অর্থশাস্ত্রম্')। যে বস্তু এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তাকে হস্তগত করাই 'লাভ'; আর যা পাওয়া গিয়েছে তার যথাযথ পরিচর্যাই 'পালন'। অর্থশাস্ত্রের অর্থনীতি বিষয়ক বেশীরভাগ বিধিবিধানই 'লাভ' ও 'পালনে'র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উচ্চারিত।

॥ ২ ॥

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রের অবিসংবাদী প্রাধান্যের কথা যে সবচেয়ে জোরালো ভাবে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেই আলোচিত হবে, তাতে অবাক হবার নেই। অর্থশাস্ত্রে রাজা তথা রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই যে সাতটি উপাদানে রাষ্ট্র গঠিত (স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, বল ও মিত্র), তার মধ্যে অন্যতম হল কোশ বা অর্থভাণ্ডার। জীবনে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থই যে প্রধান, এতে কৌটিল্যের কোনও দ্বিধা নেই (অর্থৈব প্রধানম্, অর্থমূলং ধর্মকামাবিতি)। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের আগেই কৃষির সাফল্য ও প্রসার দেখা গিয়েছিল; কৃষির উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করে রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক ক্ষমতা যে বহু পরিমাণে বাড়াত, সে প্রসঙ্গও আগের অধ্যায়ে আলোচিত। ফলে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে যখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির উদ্ভব ঘটল, তখন প্রত্যাশিতভাবেই তার চাবিকাঠি নিহিত ছিল কৃষি অর্থনীতিতে ও কৃষিজ উদ্বৃত্ত আহরণের মধ্যে। মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যে উত্তর ভারতের দুই প্রধান নদী গঙ্গা ও সিন্ধু, ও তাদের উপনদীগুলি দ্বারা বিধৌত বিশাল এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর ভারতের এই দুই নদী ব্যবস্থার উপর একটি রাজবংশের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের আগে দেখা যায়নি। এই ঘটনাটি মৌর্য আমলে কৃষিকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় ভারতের সার্বিক উর্বরতার কথা বারবার এসেছে:

Scanned with CamScanner

ভারতে জমির উর্বরতা যে অনেকাংশেই নদীগুলির অবদান, এ বিষয়েও পরবর্তী তিন গ্রীক লেখক (আরিয়ান, ডিওডোরাস ও স্ট্রাবো) যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নদীর প্রাচুর্য ছাড়াও আরও একটি উপাদান এই প্রসঙ্গে তাঁদের নজর এড়ায়নি। গ্রীক রচনাগুলিতে ভারতে বছরে দুইবার বর্ষার আবির্ভাব ও তার দরুন বছরে দুইবার ফসল ফলাবার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখনকার মতই খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে দঃ পঃ মৌসুমী বায়ু ও উঃ পূঃ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে যথাক্রমে জুন ও নভেম্বর মাসে যে বৃষ্টিপাত ঘটত, সেই ইঙ্গিত গ্রীক বিবরণীতে উপস্থিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কৌটিল্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হিসাব করার নির্দেশ দিয়েছেন ('বর্ষমানকুড্য')।

গ্রীক লেখকরা প্রধান উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধানের কথা বলেছেন। এ ছাড়াও তাঁরা গম, জোয়ার, বাজরা, তুলো ও আখ চাষের উল্লেখ করেছেন। সমকালীন ভারতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য, দুই-ই তাঁদের কার্যত মুগ্ধ করেছিল। গ্রীক বিবরণী অনুযায়ী ভারতের জনগোষ্ঠী সাতটি ভাগে বিভক্ত ; এর মধ্যে দ্বিতীয় ভাগটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে নিয়ে গঠিত। গ্রীক লেখকরা সকলেই একমত যে দ্বিতীয় বিভাগটি ছিল সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ, অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই কৃষিজীবী ছিল। মেগাস্থিনিস জানিয়েছেন কৃষকদের একমাত্র কাজ ছিল ফসল ফলানো ; অন্য কোনও দায়িত্ব তাঁদের থাকত না। যুদ্ধের সময়ও তাদেরকে বিনা বাধায় চাষ করতে দেওয়া হত। মেগাস্থিনিসের শেষ মন্তব্যটি নির্দ্বিধায় মানা মুশকিল ; কারণ অর্থশাস্ত্রের উপদেশ হ'ল যুদ্ধে শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে গেলে তার ফসল নষ্ট করতে হবে। ফলে যুদ্ধের দ্বারা চাষাবাদ ও কৃষক প্রভাবিত বা উপদ্রুত হত না, মেগাস্থিনিসের এমন ধারণা ভুল ও অতিরঞ্জিত। তবে কৃষির উপরই যে দেশের সবচেয়ে বেশী মানুষ নির্ভর করতেন, তাতে কোনও দ্বিমত নেই।

অর্থনৈতিক জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হলে কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিয়মিত তদারকি করা রাষ্ট্রের তরফে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কৃষি অর্থনীতির উপর সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, অর্থশাস্ত্রে তিনি সীতাধ্যক্ষ নামে অভিহিত (২· ২৪)। 'সীতা' কথাটির পরিভাষাগত তাৎপর্য আছে : রাজার নিজস্ব ভূসম্পদ (আজকের ভাষায় 'খাস জমি') প্রাচীন ভারতে 'সীতা' নামে আখ্যাত হত। কিন্তু সীতাধ্যক্ষের কার্যাবলীর যে বিবরণ অর্থশাস্ত্রে পাই, তাতে মনে হয় তাঁর কর্ম ও ক্ষমতা কেবলমাত্র রাজকীয় জমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; দেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার দেখাশোনা করাও তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ত। তিনি কৃষিবিদ্যা, বৃক্ষায়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী হবেন এবং যথাসময়ে ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্য, ক্ষৌম এবং কার্পাসের মত পণ্যশস্য এবং ফলমূল শাক-তরকারি—এ সবেরই বীজ সংগ্রহ করবেন (২· ২৪· ১)। বীজ সংগ্রহের পর সেগুলি রাজকীয় জমিতে ('স্বভূমৌ') বপনের দায়িত্বও সীতাধ্যক্ষেরই। ফসল ফলাবার পক্ষে 'সীতা' জমি যাতে করে উপযুক্ত হয়ে ওঠে, সে জন্যে ঐ জমি বহুবার কর্ষিত হবে

Scanned with CamScanner

('বহুলপরিকৃষ্টা')। জমিতে বীজ বপন ও চাষ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৃষি শ্রমিক নিয়োগের উপদেশ অর্থশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে : সীতাধ্যক্ষ ক্রীতদাস, বেতনভুক জনমজুর ও জরিমানা দিতে অক্ষম ব্যক্তিদের 'সীতা' জমিতে চাষের কাজে নিয়োগ করবেন ('দাস কর্মকর দণ্ডপ্রতিকেতৃ')। সীতা জমিকে উৎপাদনে ব্যবহার করার জন্য যে তাগিদ ও আগ্রহ ছিল, অর্থশাস্ত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বীজ সংগ্রহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম কৃষিশ্রমিক নিয়োগ পর্যন্ত উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অনুমান করা যেতে পারে। জরিমানা দিতে অক্ষম ব্যক্তিদের কৃষিশ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করলে রাষ্ট্রেরই আর্থিক সুবিধা ; কারণ এই জাতীয় শ্রমিককে বোধহয় কোনও বেতন বা অনুরূপ কিছু দিতে হত না—জরিমানার বদলে রাষ্ট্র তার কাছ থেকে যে শ্রম আদায় করত, তাকে উৎপাদনে লাগানো হচ্ছে। কৌটিল্য রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থের ব্যাপারে কতটা সজাগ, উপরের আলোচনা থেকে তা বোঝা যাবে। রাজার জমিতে নিযুক্ত কৃষিশ্রমিকদের আরও দুই প্রকার ভেদ অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত। একদল কৃষক সীতা জমি চাষ করবেন তাঁদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি বা উপকরণ দিয়ে ; অপর কৃষকের দল চাষ করার জন্য সীতাধ্যক্ষের কাছ থেকে কৃষির উপকরণ (হাল, বলদ, বীজ) পাবেন। দুই প্রকার কৃষিশ্রমিকের প্রাপ্যও দুইরকমের : প্রথমোক্ত কৃষক উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক পাবার অধিকারী। আর দ্বিতীয় ধরনের কৃষক কেবলমাত্র তাদের দৈহিক শ্রমকেই মূলধন করে ; তাই তারা 'স্ববীর্যোপজীবী' বলে অভিহিত এবং তাদের জন্য উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ বরাদ্দ ('চতুর্থপঞ্চভাগিক')। সীতা জমিতে নিযুক্ত এই দুই জাতীয় কৃষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও কৌটিল্য রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন : যেহেতু দ্বিতীয় প্রকার কৃষকরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বেশী সুবিধা পেয়ে থাকেন, তাই তাঁদের দ্বারা উৎপন্ন ফসলের উপর রাষ্ট্রের দাবীও অধিকতর। এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে রাষ্ট্র সরাসরি কৃষি উৎপাদনে অংশ নিচ্ছে। বীজ সংগ্রহ, কৃষক নিযুক্তি, প্রয়োজনে কোনও কোনও কৃষককে হাল বলদ যুগিয়ে দেওয়া—উৎপাদনের প্রায় সব ধাপেই প্রশাসনিক উদ্যোগ উপস্থিত। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নজীর এর আগে ভারত ইতিহাসে নেই।

কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক কৃষি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা ব্যাপক আকার ধারণ করার পিছনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এই পদক্ষেপ ছিল নতুন নতুন জনবসতি স্থাপন করার সরকারী নীতি। এই নীতি অর্থশাস্ত্রে 'জনপদ নিবেশ' নামে অভিহিত ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম ভিত্তি। কৌটিলীয় তত্ত্ব অনুযায়ী 'জনপদ' রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান ; যেহেতু তাকে 'দুর্গ' বা 'পুর' অর্থাৎ নগরাঞ্চল থেকে আলাদা করা হয়েছে, সেই হেতু 'জনপদ' কথাটি গ্রামীণ এলাকার সমার্থক। 'জনপদ' শুধু রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে একটি অপরিহার্য্য উপাদানই নয়, তা সম্পদেরও আকর ('জনপদসম্পৎ'-৬· ১)। জনপদের সম্পদ প্রধানত কৃষিসম্পদ, কারণ জনপদের সম্পদ মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। জনপদের সম্পদের

Scanned with CamScanner

উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহার কৌটিলীয় তত্ত্বে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গেলে যেমন নূতন নূতন কলাকৌশলের দরকার লাগে, তেমন কৃষির প্রসার ঘটানোও জরুরী। কৃষির প্রসার ঘটাতে গেলে অনাবাদী জমিকে চাষের আওতায় আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 'জনপদ নিবেশ' নীতির ক্ষেত্রে কৌটিল্য তাই অনাবাদী এলাকাকে চাষের উপযুক্ত করে তুলে সেখানে স্থায়ী জনবসতি গড়ে তোলার বিধান দিয়েছেন। এটি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পক্ষে এতটাই জরুরী যে কৌটিল্য নূতন জনপদ সৃষ্টি করার কাজে প্রধানত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেরই পক্ষপাতী। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী ও রামশরণ শর্মা কৌটিল্যের এই নীতির ভিতর কৃষিপ্রধান গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাপক বিস্তারের সম্ভাবনা দেখেছেন।

কৌটিল্যের মতে নূতন জনপদ এমন জায়গায় গড়ে তুলতে হবে, যেখানে আগে মনুষ্যবসতি ছিল না অথবা যে এলাকায় আগে বসবাস থাকলেও পরে তা পরিত্যক্ত হয়েছে ('ভূতপূর্বমভূতপূর্বংবা')।জনপদে বসতি সৃষ্টির জন্য দেশের ভিতরে জনবহুল এলাকা থেকে অথবা প্রয়োজনে দেশের বাইরে থেকেও রাষ্ট্রীয় তদারকিতে লোক সরিয়ে নূতন জনপদে বসাতে হবে ('স্বদেশাভিষ্যন্দবমনেন পরদেশাপবাহনেন বা')। প্রথম পদক্ষেপ থেকে দুইরকম আর্থিক সুবিধে পাওয়া সম্ভব : (ক) জনবহুল অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ কমানো ও (খ) উদ্বৃত্ত ও অপসৃত জনসংখ্যার দ্বারা জনবিরল এলাকাকে বাসযোগ্য করে তোলা। দেশের বাইরে থেকে 'অপবাহন' করে কিভাবে লোক আনা যাবে সে ব্যাপারে কৌটিল্য মন্তব্য না করলেও, কোসাম্বী তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অশোকের ত্রয়োদশ গিরিশাসনের নজীর ধরে তিনি দেখিয়েছিলেন যে কলিঙ্গের বিধ্বংসী যুদ্ধে জয়লাভের পর অশোক বহুসংখ্যক পরাজিত কলিঙ্গবাসীকে তুলে নিয়ে আসেন ('অপবুঢ়ে')। কোসাম্বী যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে কলিঙ্গের লোকদের বলপূর্বক নতুন জনপদে বসানো হয়েছিল। জনপদ সৃষ্টির জন্য মৌর্য রাজারা বলপ্রয়োগ ঘটালে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

অর্থশাস্ত্রে আদর্শ গ্রামের আয়তন সম্বন্ধে সরাসরি কিছু বলা হয়নি ; তবে জানানো হয়েছে গ্রামটি যেন কমপক্ষে পঞ্চাশটি ও সর্বাধিক পাঁচশ পরিবারের বাসের উপযোগী হয়। নূতন জনপদের অধিকাংশ বাসিন্দা হবেন শূদ্রজাতির ('শূদ্রকর্ষকপ্রায়ঃ')। অর্থশাস্ত্রের ভিন্ন একটি অধ্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে কোসাম্বী দেখিয়েছিলেন যে এই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের হাতে কোনও অস্ত্র যাতে না থাকে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র সজাগ ছিল। অতএব মৌর্যরা নতুন জনপদ পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন।

জনপদ সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য দিক হল নতুন পত্তন করা এলাকায় জমি বন্টনের নীতি। যেহেতু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পতিত জমি চাষবাসের উপযোগী করে তোলা হয়, তাই এই নতুন জনপদগুলিতে ভূমিবন্টনের কর্তৃত্ব ও অধিকারও রাষ্ট্রের হাতেই থাকে। অর্থশাস্ত্রে নতুন জনপদের জমি দুইভাগে বিভক্ত : (ক) করদ ও (খ) নিষ্কর। নিষ্কর জমি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট, যা তাঁরা

Scanned with CamScanner

বংশানুক্রমে ভোগ করতেন। প্রশাসনিক কর্মচারীদের জন্যও নিষ্কর জমি বরাদ্দ ছিল, তবে ঐ জমি তাঁরা বিক্রী করতে বা বাঁধা রাখতে পারতেন না ('বিক্রয়াধানবর্জানি')। ব্রাহ্মণদের জন্য বরাদ্দ জমিতে যেমন দানগ্রহীতাকে পূর্ণ মালিকানার অধিকার দেওয়া হচ্ছে, তেমন ব্যবস্থা কিন্তু রাজকর্মচারীদের জন্য নয়; তাঁরা কেবলমাত্র জমির উপর সীমিত ভোগাধিকার পাবেন। করদ জমি প্রজাদের মধ্যে মাত্র এক পুরুষের জন্য ('ঐকপুরুষিকানি') দেওয়া হত; এইপ্রকার জমি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আবাদযোগ্য করা হত ('কৃতক্ষেত্র')। এই 'করদ' প্রজারা রাজার জমিতে কার্যত ভাড়াটিয়ার বেশী অধিকার পেত না। অবশ্য, যদি কোনও ব্যক্তি সরকারী উদ্যোগ ছাড়াই নিজের চেষ্টায় অনাবাদী জমিকে চাষের উপযোগী করেন, তা হলে ঐ ভূখণ্ডের উপর রাষ্ট্র তার পূর্ণ মালিকানা স্বীকার করে নেবে ('অকৃতানি কর্তৃভ্যো নাদেয়ানি')। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যেহেতু কোনও ব্যক্তি নিজের প্রয়াসে জমিকে উন্নত করছেন তাই ঐ জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকার করে নিয়ে কৌটিল্য সম্ভবত তাকে উৎসাহিত করছেন। জমি বণ্টনের পর কৃষক যদি কৃষিকর্মে অমনোযোগী হন, তা হলে রাষ্ট্র ঐ জমি কৃষকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য কারোকে প্রদান করবে। রাষ্ট্রের কাছে জনপদনিবেশের মূল লক্ষ্যই হল গ্রামীণ কৃষিসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা; তাই এ বিষয়ে কৃষকের শৈথিল্য রাষ্ট্র বরদাস্ত করে না।

জনপদে নতুন বসতি গড়ে তোলার সময় প্রজাকে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধে দেবার ব্যাপারে কৌটিল্য রাজাকে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা প্রজাকে পিতার মত অনুগ্রহ করবেন ('তান্ পিতেবানুগৃহ্ণীয়াৎ'); এর জন্য কর মকুব বা লাঘব করা যেতে পারে (পরিহার); কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণাদি—বীজ, গবাদি পশু ও নগদ অর্থ প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তবে এই ব্যবস্থা নিঃশর্ত দান নয়, কারণ প্রজাদের তরফ থেকে তাদের সুবিধেমত ঐ বস্তু ফেরৎ দিতে হবে ('তান্যনু সুখেন দদ্যুঃ')। অর্থশাস্ত্রে প্রজাদের প্রতি এই 'অনুগ্রহ' প্রদর্শনের নীতিটি আসলে কৃষিঋণের সামিল। মনে হয় নতুন পত্তন করা জনপদে প্রজাদের আকৃষ্ট করার জন্যই এই জাতীয় নীতির কথা ভাবা হয়েছিল। তবে আপাতদৃষ্টিতে এইপ্রকার নরম নীতি নেওয়ার পিছনেও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত: অর্থশাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ 'অনুগ্রহের' নীতি 'কোশবৃদ্ধি'র পক্ষে সহায়ক, ততক্ষণই তার উপযোগিতা আছে; এই নীতির ফলে যদি কোশের অপঘাত ঘটে তা হলে তা বর্জনীয় ('কোশোপঘাতকৌ বর্জয়েৎ')। অনুমান করা চলে নানারকম কর ছাড়, সুবিধাজনক শর্তে কৃষিঋণের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা অধিকসংখ্যক মানুষ আকৃষ্ট হয়ে যদি কৃষিজীবী বসতি গড়ে তোলে, তাহলে তা কৃষি অর্থনীতির প্রসারেই সহায়তা করবে, যে ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে অনুকূল।

জনপদনিবেশ নীতি কৃষি উৎপাদনের পক্ষে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে নতুন জনপদে প্রমোদকানন, বিনোদনের স্থান অবাঞ্ছিত; নট, নর্তক, গায়কের ও বাদকের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কারণ এই প্রমোদের উপকরণগুলি কাজে বিঘ্ন ঘটায়

Scanned with CamScanner

('কর্মবিঘ্নং কুর্যুঃ')। জনপদে ... জনসম্পদ, কোশ, পণ্যদ্রব্য সবকিছুরই বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, এই অভিমত কৌটিল্যের। তাই তিনি উপদেশ দেন যে রাজা পুরাতন জনপদগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন ও নিয়মিতভাবে নতুন নতুন জনপদ পত্তন করে চলবেন ('রক্ষেৎপূর্বকৃতান্ রাজা, নবাংশ্চ অভিপ্রবর্ত্তয়েৎ')। উপরের আলোচনা থেকে যে ঘটনাটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হল কৃষি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের উৎপাদকের ভূমিকা গ্রহণ।

কৃষি অর্থনীতির সাফল্যের জন্য ভারতবর্ষে সব যুগেই সেচব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় 'এ্যাগোরানোময়' নামক যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কথা জানা যায়, তাঁরা মূলত গ্রামীণ এলাকার তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁদের অন্যতম কর্তব্য ছিল জলসেচ ব্যবস্থার তদারকি করা। উদকবন্ধ বা 'স্লুইস'-এর উপরও তাঁরা নজর রাখতেন, যার ফলে, মেগাস্থিনিসের মতে, সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল সুষ্ঠ ও নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা যেত। এই তথ্যের মধ্যে দিয়ে সেচব্যবস্থার প্রতি মৌর্যদের আগ্রহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেচব্যবস্থার উপর তদারকি সামগ্রিক কৃষি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে জোরদার করত। মৌর্য আমলে সেচব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের চেহারাটি গুজরাটের জুনাগড়ে অবস্থিত সুদর্শন হ্রদের ইতিহাস থেকে বোঝা যাবে। রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তিতে (১৫০ খ্রীঃ) বলা হয়েছে যে সুদর্শন হ্রদ নামক এক বিশাল জলাধার মৌর্য আমলে—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে–তৈরী হয়েছিল ; চন্দ্রগুপ্তের অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসক ('রাষ্ট্রীয়') পুষ্যগুপ্ত এই জলাধার নির্মাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ঐ একই প্রশস্তিতে জানা যায় যে অশোকের আমলে (যখন ঐ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন যবনরাজ তুষাস্ফ) জলাধারটিতে কয়েকটি প্রণালী সংযুক্ত হয় ('প্রণালিভিরলঙ্কৃতম্')। ঐ প্রণালীগুলি দিয়ে সম্ভবতঃ সেচের প্রয়োজনীয় জল কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ হত। মধ্যপ্রদেশের বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশা) উৎখনন চালিয়ে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর খ্রীঃ পূঃ ৩০০ নাগাদ নির্মিত একটি সেচখালের ধ্বংসাবশেষ (১৮৫′ × ৭′ × ৫½′) উদ্ধার করেন। এই বৃহদায়তন প্রণালী নির্মাণের খরচ ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে হয় ; সেক্ষেত্রে এই প্রণালী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই গঠিত হয়েছিল বলে ধরতে হবে। খালের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থার কথা অর্থশাস্ত্রেও উল্লিখিত। এছাড়াও আরও নানা রকম সেচ প্রকল্পের কথাও অর্থশাস্ত্রে আছে (৩·৯)। লক্ষ্যণীয় এই যে অর্থশাস্ত্রে সেচ ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে জোরালো সওয়াল করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্র 'উদকভাগ' নামক জলকর কৃষকের কাছ থেকে আদায় করত। এই সাক্ষ্যটিও সেচ ব্যবস্থার উপর মৌর্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত দেয়।

কৃষি উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ, উদ্যোগ ও নজরদারি নিতান্ত কম ছিল না। কৃষি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা কার্যকরী ছিল তা বুঝতে গেলে আলোচ্য যুগে ভূমি ব্যবস্থা ও সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও অধিকার কেমন ছিল, তা

Scanned with CamScanner

অনুধাবন করা নিতান্ত জরুরী। কৃষি অর্থনীতিতে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রাচীন ভারতে জমির উপর মালিকানা কার ছিল তা নিয়ে এ পর্যন্ত বহু বিতর্ক হয়েছে ও হচ্ছে। মৌর্য যুগে জমির মালিকানা কেমন ছিল, এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি নিয়েও মতপার্থক্য যথেষ্ট।

মেগাস্থিনিস এবং অন্য তিন গ্রীক লেখকের বর্ণনায় দেখা যায় যে ভারতে সব জমিই রাজার মালিকানাধীন ; রাজাই একচেটিয়া ভূসম্পত্তির মালিক এবং রাজা ব্যতীত আর কোনও ব্যক্তিরই জমির উপর কোনও অধিকার নেই। তার ফলে জমিতে বসবাসকারী ও কৃষিজীবী সব মানুষই কার্যত রাজার ভাড়াটিয়াতে পর্যবসিত হয়। ডিওডোরাসের মতে প্রজারা রাজাকে জমির মালিক হিসেবে ফসলের এক চতুর্থাংশ দেয় ও খাজনা প্রদান করে। স্ট্রাবোর বর্ণনায় ভিন্নতা লক্ষ্যণীয় : তিনি লিখেছেন যে প্রজারা উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ রাজার কাছ থেকে পায়—অর্থাৎ রাজাকে তারা ফসলের তিন চতুর্থাংশ দেয়। করের হার নিয়ে দুই প্রাচীন লেখকের বর্ণনায় বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়েই জমির ওপর পূর্ণ রাজকীয় মালিকানার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। রাজা যে স্বয়ং জমির মালিক ছিলেন, সংস্কৃত 'সীতা' শব্দেও তা প্রমাণিত। 'সীতা' বলতে অর্থশাস্ত্রে খাস জমি বোঝানো হয়েছে এবং তা রাজার নিজস্ব জমির ('স্বভূমি') সমার্থক। 'সীতা' জমির ওপর পূর্ণ মালিকানা ছাড়া আরও সাত প্রকার জমির ওপর রাজার 'বিশেষ' অধিকারের ধারণা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে স্বীকৃত। এই সাত প্রকার জমি : (১) পতিত জমি, (২) অরণ্য, (৩) নতুন পত্তন করা জনপদ, (৪) খনি ও খনিজ সম্পদ, (৫) সেচপ্রকল্প, (৬) ব্রজ বা গোচারণভূমি ও (৭) গুপ্তধন। কিন্তু সীতা জমির উপর রাজার যে মালিকানার অধিকার ছিল, এই সাত প্রকার জমির ওপর রাজার বিশেষ সার্বভৌম অধিকার তার থেকে পৃথক। রোমিলা থাপার রাজকীয় জমি (সীতা) ও রাষ্ট্রীয় জমি (উপরি উক্ত সাতপ্রকার জমি)-র মধ্যে প্রভেদ করার পক্ষপাতী। রাজা তথা রাষ্ট্রশক্তির হাতে যদি বহুপ্রকার জমির ওপর অবিসংবাদী কর্তৃত্ব থাকে, তাহলে তা কার্যতঃ ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে, ব্যক্তিগত মালিকানাকে খর্বও করতে পারে। তাহলে কি গ্রীক লেখকরা জমির উপর মালিকানার প্রসঙ্গে যে চূড়ান্ত রাজকীয় মালিকানার কথা বলেছিলেন, তা যথার্থ ও বাস্তবানুগ ?

কিন্তু যে অর্থশাস্ত্রে সীতা জমিতে রাজার তর্কাতীত মালিকানা ও অন্য সাত প্রকার ভূখণ্ডে রাজার বিশেষ অধিকারের ইঙ্গিত দেওয়া আছে, সেই অর্থশাস্ত্রেই জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ ও বিবাদ মেটাবার জন্য আইনগত ব্যবস্থাদির কথাও বলা আছে। সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই জমির মালিকানা নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদ ও বিবাদের ফয়সালা করার জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট রীতিপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়াও কৌটিল্য 'প্রণষ্টস্বামিকম্' জাতীয় ক্ষেতের উল্লেখ করেছেন ; এই জাতীয় জমির মালিক দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে জমিতে তার স্বামিত্ব বা মালিকানা বাতিল হয়ে যেত। এই উক্তিও মৌর্য আমলে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার

Scanned with CamScanner

প্রতি ইঙ্গিত দেয়। প্রাক-মৌর্য ও মৌর্যোত্তর আমলে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ জমির লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধকে যে জেতবন বিহার দান করেছিলেন, তা অনাথপিণ্ডিকের সম্পত্তি ছিল না। তিনি ঐ বাগান আসল মালিকের কাছ থেকে কেনার পর বুদ্ধকে দান করেছিলেন। দান, বিক্রয়, বাঁধা রাখার অধিকার জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। জেতবন বিহার অন্ততঃ দুইবার হাতবদল হয়েছিল : প্রথমে বিক্রী ও পরে দান। এই তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। একইভাবে মৌর্যোত্তর পর্বে (সাতবাহন সাম্রাজ্যে) রাজকীয় জমি ('রাজকং ক্ষেত্তং') নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু বৌদ্ধ সংঘকে জমি দান করার সময় ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা ঋষভদত্ত বারাহীপুত্র অগ্নিভূতি নামক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক (পিতুসতকং/পিতৃস্বত্বকং) জমির অংশ বিশেষ প্রথমে কিনে নিয়েছিলেন। এখানেও জমির দুইবার হাতবদলের নজীর পাওয়া যাবে। এই ঘটনাটিও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। অধিকাংশ পণ্ডিতই প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; মৌর্য আমলও সম্ভবতঃ এর ব্যতিক্রম ছিল না। মৌর্য আমলের ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে সাম্প্রতিক এক আলোচনায় বনগার্ড লেভিন জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে মৌর্য আমলে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার সংকুচিত হয়েছিল, গ্রীক বিবরণীর ভিত্তিতে এমন অনুমানের সপক্ষে সমকালীন অন্য তথ্যসূত্র পাওয়া কঠিন। কৃষি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকলে তা জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাকে নস্যাৎ করেনি। তবে রাষ্ট্রের হাতে 'সীতা' জমির উপর সরাসরি মালিকানার অধিকার ও অন্য সাত প্রকার জমির ওপর বিশেষ অধিকার থাকায় সমগ্র ভূমি ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। মেগাস্থিনিস সম্ভবত রাজকীয় জমিতে রাজার ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ও অন্যান্য সাতরকম জমিতে রাজার বিশেষ সার্বভৌম অধিকারকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি। তাই তাঁর কাছে জমির ওপর একচেটিয়া রাজকীয় মালিকানার সম্ভাবনাই জোরালো হয়ে উঠেছিল। তবে একথাও খেয়াল রাখতে হবে যে মেগাস্থিনিস তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্রে বসে। পাটলিপুত্র ও সন্নিহিত অঞ্চলের জমি সরাসরি রাজকীয় মালিকানাধীনে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। এই জাতীয় 'সীতা' জমিতে সম্ভবত দুই বা ততোধিক জাতীয় কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকবে। কিন্তু পাটলিপুত্র ও তার নিকটস্থ এলাকাতে রাজকীয় মালিকানার যে নজীর স্বাভাবিক, বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই ব্যবস্থা চালু থাকা প্রায় অসম্ভব। মেগাস্থিনিস মৌর্য ভূমিব্যবস্থা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সম্ভবত পাটলিপুত্রের অবস্থা ব্যবস্থাকে সমগ্র মৌর্য সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্রের হাতে বিপুল পরিমাণ ভূসম্পদ থাকার ফলে কৃষি অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা

Scanned with CamScanner

সহজতর হয়েছিল।

॥ ৩ ॥

উৎপাদনের অন্য দিকটিতে এবারে নজর দেওয়া যাক। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষিজাত উদ্বৃত্তের উদ্ভব ঘটায় বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত কারিগরদের কার্যকলাপের পথ সুগম হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়েই শিল্প অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য ও সংগঠনের কথা আলোচিত হয়েছে। গ্রীক লেখকরা শিল্পী ও কারিগরদের সমাজের চতুর্থ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সমাজে যথেষ্ট সংখ্যক শিল্পীর উপস্থিতি থাকলে তবেই তা বিদেশী লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে শিল্প অর্থনীতি, কারিগর ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তিন গ্রীক লেখকের বর্ণনায় ফারাক আছে। আরিয়ানের মতে সকল শিল্পই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত ও সব কারিগরই রাষ্ট্রের বেতনে প্রতিপালিত ; তাই কারিগরদের কাছ থেকে রাষ্ট্র কোনও কর দাবী ও আদায় করে না। আরিয়ান শিল্পে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু ডিওডোরাস ও স্ট্রাবোর বর্ণনা খানিকটা ভিন্ন। তাঁদের মতে জাহাজ নির্মাণ ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ এই দুই শিল্প সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অধীন ছিল ; এই দুই শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্থান নেই। এই দুই শিল্পে নিযুক্ত কারিগররা রাষ্ট্রের বেতনে প্রতিপালিত বলে তাঁদের কোনও কর দিতে হত না। স্ট্রাবো ও ডিওডোরাস সম্ভবত এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই দুই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাদ দিলে অন্যান্য শিল্পে বোধহয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের অস্তিত্ব ছিল। তবে সরাসরি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত না হলেও অন্যান্য কারিগরী শিল্পের উপর সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক নজরদারি অব্যাহত ছিল। কারণ মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে নিযুক্ত একদল রাজকর্মচারীর উল্লেখ করেছেন যাঁদের কর্তব্য ছিল যাবতীয় কারিগরী শিল্প ও শিল্পোৎপাদনের উপর তদারকি করা। এই শিল্প উদ্যোগগুলি সম্ভবত বেসরকারী তথা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনাতেই পরিচালিত হত।

শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার চিত্রটি আরও স্পষ্টভাবে অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত। কৌটিল্যের মতে শিল্পোৎপাদনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, কারণ 'কারু' বা কারিগরদের অসাধু ক্রিয়াকলাপ ও প্রবণতা থেকে প্রজাদের রক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ('কারুরক্ষণ')। অর্থশাস্ত্রে 'কারু' বা কারিগরদের রাষ্ট্রের পক্ষে কণ্টকের মত মারাত্মক বলে মনে করা হয়, যার যথাযথ শোধন হওয়া আবশ্যক ('কণ্টকশোধন')। এই উপদেশের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রতি অনীহা স্পষ্ট। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে শিল্পজগতে 'গিল্ড' জাতীয় কারিগর সংঘের যে উত্থান দেখা যাচ্ছিল, তা বোধহয় মৌর্য আমলে সংকুচিত হয়। কারণ 'কারু' সংঘের প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে কৌটিল্য সন্দিগ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। কারুসংঘের প্রভাব বাড়লে তা হয়তো শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য বিস্তারের পক্ষে অনুকূল হত না। তাই কৌটিল্য কারুজীবীদের সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয়

Scanned with CamScanner

নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখার পক্ষপাতী।

প্রাক ৩০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে শিল্প অর্থনীতিতে উন্নয়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ধাতু ব্যবহারের প্রসার ঘটায়। আগেই বলা হয়েছে অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী যাবতীয় খনি ও খনিজ দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র খনি ও খনিজশিল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা বিষয়ে সম্যকভাবে সচেতন। খনি ও খনিজশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি হবে, সে বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের নীতি পর্যালোচনা করা যাক।

খনি বা 'আকর' যেহেতু রাষ্ট্রের মালিকানাধীন, ফলে খনিজশিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কায়েম করার কথাই অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে। 'আকর' বা খনির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতাও কৌটিল্য ব্যাখ্যা করেছেন : 'আকর' থেকেই কোশের জন্ম ; আবার কোশ থেকে দণ্ড বা সেনাবাহিনীর উদ্ভব (অর্থাৎ কোশের দ্বারা সেনাবাহিনী প্রতিপালিত হয়) ; কোশ ও দণ্ড—এই দুই উপাদানের সাহায্যে রাজা সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ('আকর প্রভবঃ কোশঃ, কোশাদ্দণ্ড প্রজায়তে ; কোশদণ্ডাভ্যাং প্রাপ্যতে পৃথিবী কোশভূষণা')। 'কোশ' ও 'দণ্ড' উভয়েরই মূল যে 'আকর' বা খনিতে নিহিত, এটাই কৌটিল্য বোঝাতে চেয়েছেন। ফলে এত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে উৎপাদন ব্যবস্থা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনেই হওয়া সম্ভব। যাবতীয় খনি ও খনিজ শিল্পের উপর তদারকি যিনি করেন তিনি অর্থশাস্ত্রে 'আকরাধ্যক্ষ' নামে অভিহিত (২·১২)। আকরাধ্যক্ষ খনি ও ধাতু বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হবেন ; কোন অঞ্চলের খনি থেকে কি সম্পদ আহরণ করা যাবে, এ ব্যাপারেও তিনি সম্যক অবহিত থাকবেন। খনি থেকে ধাতু নিষ্কাশনের দায়িত্ব সাধারণভাবে রাষ্ট্রের। তবে কৌটিল্য এখানে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবার পক্ষপাতী। অল্প ব্যয়সাপেক্ষ খনিগুলি খোঁড়ার ব্যাপারে রাষ্ট্র সরাসরি উদ্যোগ নেবে এবং বোধহয় কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অস্তিত্ব এখানে থাকবে না ('লাঘবিকম্ আত্মনা কারয়েৎ') ; কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ খনি থেকে আকর অবস্থায় ধাতু নিষ্কাশনের জন্য রাষ্ট্র বেসরকারী উদ্যোগকে মেনে নেবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা দরকার। ব্যয়বহুল খনিতে বেসরকারী উদ্যোগের উপস্থিতি হবে শর্তসাপেক্ষ : এই জাতীয় খনি থেকে উৎপন্ন খনিজ পদার্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজকোষে দেয় ('ব্যয়ক্রিয়াভারিকমাকরং ভাগেন প্রক্রয়েন বা দদ্যাৎ'), কারণ তত্ত্বের বিচারে রাষ্ট্রই সব খনির মালিক। ব্যয়বহুল খনিতে রাষ্ট্র সরাসরি উৎপাদনে অংশ না নেওয়ায় তার দ্বারা ব্যয় সংকোচ করা যাবে। অন্যদিকে উদ্যোগ তথা বিনিয়োগ না করেই রাষ্ট্র বেসরকারী উদ্যোগের কাছ থেকে খনিজ দ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ 'ভাগ' বা অংশ পাবার অধিকারী। অতএব রাষ্ট্র দুদিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে। কৌটিল্য যখন খনিজ শিল্পোৎপাদনে বেসরকারী উদ্যোগকে আহ্বান জানান, তখন তার মধ্যে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রয়াসই প্রতিফলিত হয়।

খনি থেকে খনিজ দ্রব্য নিষ্কাশিত হলে আকরাধ্যক্ষ সেগুলি বিভিন্ন ধাতুর জন্য নির্দিষ্ট 'কর্মান্ত' বা কারখানায় পাঠাবেন। এই কারখানাগুলিও রাষ্ট্রীয়

Scanned with CamScanner

মালিকানাধীন। আকরাধ্যক্ষের অধস্তন কর্মচারীদের (ঐরা বিভিন্ন কর্মান্তের দায়িত্বে ন্যস্ত) তালিকাটি নিম্নরূপ : 'লোহাধ্যক্ষ', 'খন্যধ্যক্ষ', 'রূপিক', 'রূপদর্শক' ও 'লবণাধ্যক্ষ'। খেয়াল রাখার দরকার যে প্রাচীন ভারতে লবণ তৈরীর অধিকার তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকারের আওতায় ছিল, কারণ লবণও ধাতু তথা খনিজ পদার্থ বলে ধরা হত। বিভিন্ন কারখানায় খনিজ ও ধাতব পদার্থ দিয়ে উৎপাদন সম্পন্ন হলে উৎপন্ন দ্রব্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিক্রী ও সরবরাহের নির্দেশও অর্থশাস্ত্রে আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে ধাতব বস্তুর উৎপাদন ও বিক্রয় কখনওই এক জায়গা থেকে হবে না। কারখানা থেকে বার হবার সময় প্রতিটি শ্রমিকের উপর তল্লাশী চালানো হবে, যাতে করে কারখানা থেকে ধাতব বস্তু কেউ লুকিয়ে না নিয়ে যেতে পারে। খনিজ শিল্পে খনির উপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ, খনি থেকে আকর নিষ্কাশন, নিষ্কাশিত আকরের জন্য উপযুক্ত কারখানা গড়ে তোলা ও তাতে উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী—সর্বস্তরেই রাষ্ট্রের প্রবল কর্তৃত্ব চোখে পড়ে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে খনিজ শিল্পকে 'ভারী শিল্প' হিসেবে বোধহয় বিচার করা চলে। এত প্রাচীন কালে একটি বিশেষ শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের এত ব্যাপক রূপ বেশী জানা নেই।

আরও একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা এই ক্ষেত্রে অযৌক্তিক হবে না। অশোকের একটি গৌণ গিরি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে মৌর্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশের প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র ছিল সুবর্ণগিরি, যেখানে মৌর্য সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন একজন 'আর্যপুত্র' বা রাজকুমার। সুবর্ণগিরি বর্তমান কর্ণাটকের অন্তর্ভুক্ত। সুবর্ণগিরি স্থান নামটির সঙ্গে স্বর্ণখনির অস্তিত্ব থাকার সম্পর্ক অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। প্রত্নতাত্ত্বিক রেমণ্ড অলচিন দেখিয়েছেন যে সুবর্ণগিরির সন্নিহিত অঞ্চলে আকরিক সোনা থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। (এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বর্তমান ভারতের অন্যতম প্রধান স্বর্ণখনি কোলার উত্তর কর্ণাটকেই অবস্থিত)। অলচিনের মতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণ করা যায় যে অতি প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে নিয়মিত ধাতু নিষ্কাশন করা হত। এই এলাকার খনিতে সোনা পাওয়া যাওয়ার ফলেই হয়তো মৌর্য আমলে সুবর্ণগিরি নামটির উদ্ভব হয়। অলচিন আরও জানিয়েছেন যে কর্ণাটকের সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চলে প্রাচীন হীরার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ; ঐ একই এলাকায় বা তার কাছাকাছি নানা জায়গায় অশোকের অনুশাসনও পাওয়া গিয়েছে। অতএব সিদ্ধান্ত করা চলে মৌর্য প্রশাসন দাক্ষিণাত্যের খনিজ সম্পদ বিষয়ে সচেতন ও আগ্রহী ছিলেন। সুবর্ণগিরিতে যে একটি প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র গড়ে তোলা হল ও সেখানে একজন মৌর্যবংশীয় রাজপুত্রের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ বোধহয় এই অঞ্চলের সোনা ও হীরক খনিতে অর্থনৈতিক উৎপাদন করার ব্যাপারে মৌর্য রাষ্ট্রের আগ্রহ ও উদ্যোগ।

অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিতে অনুমান করা সম্ভব যে আরও দুটি শিল্পোদ্যোগে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা ছিল : এই দুটি শিল্প হল বস্ত্রশিল্প ও সুরাশিল্প যা যথাক্রমে 'সূত্রাধ্যক্ষ' (২·

Scanned with CamScanner

২৩) ও 'সুরাধ্যক্ষ' (২· ২৫) নামক দুই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। সূত্রাধ্যক্ষ রাষ্ট্রীয় কারখানায় সুতো উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ; এই কারখানায় নিযুক্ত অধিকাংশ শ্রমিকই মহিলা। সুতো কাটায় মহিলাদের স্বাভাবিক দক্ষতার কথা মনে রেখেই বোধহয় এইরকম নির্দেশ কৌটিল্য দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহিলা কর্মীরা কি পরিমাণে সুতো উৎপাদন করছেন, তার উপর তাঁদের বেতন নির্দ্ধারিত হত। কোনও কর্মীই স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন না। কৌটিল্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগেই বেশী আগ্রহী। নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতো তৈরী না হলে আনুপাতিক হারে শ্রমিকের বেতন কাটার পরামর্শও অর্থশাস্ত্রে আছে ('সূত্রহ্রাসে বেতনহ্রাস')। সূত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের ছবিটি এখানে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তবে বস্ত্রশিল্প ও সুরাশিল্প প্রাচীন ভারতের এত বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল যে সমগ্র ভারত জুড়ে এই দুই শিল্পে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মনে হয় এই দুই শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগ মেনে নেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর বোধহয় প্রশাসনিক নজরদারি চলত ; আর সুরা ও সুতো উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিও সক্রিয় ছিল।

শিল্পোৎপাদনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের তিনটি পৃথক চরিত্র ও ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। (১) খনিজ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ ও অস্ত্র নির্মাণ জাতীয় উদ্যোগ যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত ও প্রায় একচেটিয়া ; রাষ্ট্রের আর্থিক ফায়দার সম্ভাবনা থাকলে অবশ্য শর্তসাপেক্ষে খনিজ শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্থান দেওয়া চলত। (২) বস্ত্র ও সুরা শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিজস্ব কারখানা ও রাষ্ট্রনিযুক্ত কর্মী ছিল ; কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংস্থার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগের অস্তিত্বও মেনে নেওয়া হয়েছিল। (৩) অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প উদ্যোগ যার উৎপাদনে রাষ্ট্র সরাসরি অংশ নিত না ; কিন্তু এই জাতীয় উৎপাদকের ওপর নানারকম কর বসিয়ে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত।

॥ ৪ ॥

উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পণ্যসামগ্রীর ভোগ ও সরবরাহের প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উৎপাদন হবার পর পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছয় বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় তদারকিতে কৃষি ও শিল্পে যা উৎপন্ন হত তার সরবরাহ ও লেনদেন কিভাবে চলত, অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় তা অনুধাবন করা বিশেষ জরুরী।

ব্যবসা বাণিজ্য সচরাচর গ্রামীণ বসতির বাইরে হাটবাজার, গঞ্জ বা নগরে ঘটে থাকে। তাই গ্রীক বিবরণীতে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা স্থান পেয়েছে নগর প্রশাসনের প্রসঙ্গে। মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্রে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হত ছয়টি সমিতির দ্বারা (প্রতিটি সমিতিতে পাঁচজন করে সদস্য ;

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ মোট ত্রিশ জন সদস্য), এ কথা গ্রীক রচনায় আছে। এই কর্মচারীরা 'অ্যাস্টিনোময়' নামে খ্যাত। চতুর্থ সমিতিভুক্ত সদস্যরা বাজারে আনীত পণ্যের উপর নজর রাখতেন, যাতে পুরাতন ও নতুন পণ্য কেউ মিশিয়ে (= ভেজাল দিয়ে ?) বিক্রী করতে না পারে। বিক্রেতা কেবলমাত্র একটি পণ্যেরই কারবার করতে পারতেন, একাধিক পণ্যের ব্যবসা করতে গেলে সরকারকে দুই গুণ কর দিতে হত। গ্রীক সূত্র থেকে পাওয়া এই তথ্যগুলির সমর্থনে অন্য কোনও জাতীয় তথ্য আমাদের জানা নেই বলে গ্রীক বিবরণীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে ব্যবসা বাণিজ্য যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল, তার আভাস অবশ্যই গ্রীক বিবরণে উপস্থিত। ষষ্ঠ সমিতির সদস্যগণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বিক্রয়জাত অর্থের উপর এক দশমাংশ কর আদায় করতেন বলে মেগাস্থিনিস জানিয়েছেন ; তাঁর মতে এই কর না দিলে দোষী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। এর থেকে বোধহয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 'বিক্রয় করের' সমতুল্য কোনও কর নেবার নজীর দেখা যায়। গ্রীক বর্ণনা অনুসারে ত্রিশ জন সদস্য সম্মিলিত ভাবে বাজার,গঞ্জ ও বন্দরের দেখাশোনা করতেন। এই তথ্যটি মৌর্য আমলে বাণিজ্যের উপর প্রশাসনিক তদারকির ইঙ্গিত দেয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিতরে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বেশ কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল ; এই উপকূলগুলিতে বন্দরের অস্তিত্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই বন্দরের উপর প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে মৌর্যরা একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় পরিচালনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন (এর সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের 'নাবধ্যক্ষে'র দায়িত্ব কর্তব্য তুলনা করা যেতে পারে)।

বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়মিত হতে গেলে যাতায়াতের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। গ্রীক বিবরণীতে উল্লিখিত 'এ্যাগোরানোময়' জাতীয় কর্মচারীদের অন্যতম কর্তব্য ছিল পথঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও পথের ধারে প্রতি দশ স্টেডিয়া অন্তর দূরত্ব নির্দেশক ও দিক নির্দেশক ফলক বসানো। অশোকের প্রায় সমসাময়িক গ্রীক লেখক এরাটোস্থেনেস (খ্রীঃ পূঃ ২৭৫-১৯৪) লিখেছেন যে মৌর্য রাজধানী পালিম্‌বোথরা বা পাটলিপুত্র থেকে একটি দীর্ঘ রাজপথ উঃ পঃ সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম এশিয়ার দিকে গিয়েছিল। অতি সম্প্রতি ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আফগানিস্তানের লাঘমানে আবিষ্কৃত আরামীয় ভাষায় ও হরফে লিখিত অশোকের দুটি অনুশাসনে রাজপথের উল্লেখ দেখেছেন। অনুশাসনে রাজপথ 'কারপথি' বলে অভিহিত ('কার' বা 'কর' ইরানীয় শব্দ, তার অর্থ রাজা/প্রভু ; 'পথি'=পথ ; অর্থাৎ 'কারপথি' বলতে রাজপথকেই বোঝায়)। অনুশাসনটিতে বেশ কয়েকটি স্থানের নাম ও তাদের দূরত্বের কথাও বলা হয়েছে। আর আছে ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর পরিচয় যিনি 'পূর্ত্তবগ' বা 'পূর্তভাগ' অর্থাৎ পূর্ত্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত বলে আখ্যাত। সম্ভবত এই জাতীয় কোনও রাজপথের বর্ণনাই গ্রীক লেখকরা দিয়েছিলেন। অশোকের লাঘমান অনুশাসন দুটি কার্যত দিক ও দূরত্ব নির্দেশক ফলক, যার কথা গ্রীক বিবরণীতে বলা হয়েছে। 'পূর্ত্তভাগ' জাতীয়

Scanned with CamScanner

কর্মচারী বোধহয় গ্রীক বর্ণনার 'এ্যাগোরানোময়'দের সমতুল্য। গ্রীক বিবরণীগুলি ও দুটি অশোকানুশাসনের যৌথ সাক্ষ্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে মৌর্য আমলে যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্নত করতে প্রশাসন আগ্রহী ও উদ্যোগী ছিল।

ব্যবসা বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা কি হবে, সে ব্যাপারে প্রভূত বিধিবিধান স্বাভাবিকভাবেই অর্থশাস্ত্রে উপস্থিত। ব্যবসায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ জারী করার পক্ষে কৌটিল্যের মূল যুক্তি এই যে বৈদেহক বা বণিক রাষ্ট্রের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ ও 'কারু'দের মতই তাদের থেকে প্রজাকুলকে রক্ষা করা ('বৈদেহক রক্ষণম' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বিশেষ জরুরী। তাঁর বিচারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বই বণিকের ক্রিয়াকলাপকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। বণিকের বেআইনী ও লোভাতুর ক্রিয়াকলাপের নানা নজীরও অর্থশাস্ত্রে আছে।

যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উপর বাণিজ্য পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি অর্থশাস্ত্রে পণ্যাধ্যক্ষ (২· ১৬) নামে অভিহিত। পণ্যাধ্যক্ষকে এমন এক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হতে হবে যিনি বাজারে আনীত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, সেগুলি কোথায় উৎপন্ন, স্থলপথ না জলপথে বাজারে আনীত, তাদের চাহিদা ও যোগানের চরিত্র ও দামের ওঠাপড়া বিষয়ে সম্যক অবহিত থাকবেন (নানাবিধানাং পণ্যানাং, স্থলজলজানাং, স্থলপথবারিপথোপয়াতানাং, প্রিয়াপ্রিয়তাং, অর্ঘান্তরং চাবেক্ষেত।)। বাজার সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি জানা থাকলে তবেই পণ্যাধ্যক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী বাণিজ্যিক নীতি নির্দ্ধারণ করতে পারবেন। পণ্যাধ্যক্ষের নীতি স্বদেশে ও বিদেশে ('পরদেশে')—দুই জায়গাতেই প্রযোজ্য। স্বদেশে তিনি বাজারের অবস্থা বুঝে 'বিক্ষেপ' ও 'সংক্ষেপ' নীতি নেবেন। বাজারে কোনও পণ্য প্রচুর পরিমাণে (অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে বেশী) এলে ('পণ্যবাহুল্য') ঐ পণ্যের দাম পড়তির দিকে যাবে। এই অবস্থা বেশী দিন চললে বাজারের ভারসাম্য বজায় থাকবে না ও উৎপাদকের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা। ফলে রাষ্ট্র ঐ পণ্য নিজের উদ্যোগে ক্রয় করবে ও ঐ পণ্যের একটি মজুতভাণ্ডার গড়ে তুলবে। এর ফলে ঐ পণ্যের পতনোন্মুখ দাম রহিত হবে ; মজুতভাণ্ডারে রাখা পণ্য রাষ্ট্র প্রয়োজনে বিতরণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পণ্যক্রয়ে অংশ নিচ্ছে, এবং এই নীতির দ্বারা উৎপাদকের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় রাষ্ট্র উদ্যোগ নিচ্ছে। অন্যপক্ষে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা বণিকদের অসাধুতার কারণে যদি বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যায়, তা হলে দামের ঊর্দ্ধগতি দেখা দেবে ও তাতে ক্রেতার স্বার্থক্ষুণ্ণ হবে। সেক্ষেত্রে পণ্যাধ্যক্ষ মজুতভাণ্ডারে সংগৃহীত পণ্য বাজারে সরবরাহ করবেন। এর ফলে দামের ঊর্দ্ধগতি আটকানো যাবে। পণ্যাধ্যক্ষ এ ক্ষেত্রে ক্রেতার সুবিধার্থে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। অর্থশাস্ত্রের এই উপদেশের আলোকে মৌর্য আমলের সমকালীন দুটি লেখ-র তথ্য বিচার করা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রনগরে (মহাস্থানগড়, বগুড়া জেলা, বাংলাদেশ) আপৎকালীন অবস্থা (অত্যায়িক) দেখা দেওয়ায় স্থানীয় কোষ্ঠাগার থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য, শস্য ও অর্থ বিতরণ করা হয়। একইভাবে উত্তরপ্রদেশে সোগৌড়া

Scanned with CamScanner

লেখতেও কোষ্ঠাগার থেকে ত্রাণের উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করার ঘটনা জানা যায়। এই দুটি লেখ-এর ভাষা, হরফ ও বক্তব্যের ধাঁচধরণ বিচার করলে তা মৌর্য আমলেই লিখিত বলে অনুমান করা যায়। ঠিক কি কারণে এই ত্রাণ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল তা না জানা গেলেও এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে রাষ্ট্রের হাতে পণ্যসামগ্রী যথেষ্ট মজুত না থাকলে এই জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে পণ্যাধ্যক্ষ বা অনুরূপ কর্মচারী যে রাষ্ট্রের তরফে সরাসরি কেনাবেচা ও বণ্টন ব্যবস্থায় অংশ নিতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সাধারণ পণ্যের লেনদেন ছাড়াও 'রাজপণ্য' (অর্থাৎ রাজকীয় খেতখামার ও কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদি) বিক্রয়ের দায়িত্বও পণ্যাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত। রাজপণ্য সব সময়েই 'একমুখে' অর্থাৎ কেন্দ্রীকৃত সরবরাহ ব্যবস্থা দ্বারা বিক্রীত হবে। কেন্দ্রীকৃত সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্যে রাজপণ্যগুলিকে বেসরকারী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আওতা থেকে দূরে রাখা যাবে। রাজপণ্য বিক্রী করার জন্য পণ্যাধ্যক্ষ বেসরকারী বণিকদের (**বৈদেহক**) নিয়োগ করতে পারেন। এই বেসরকারী বণিকরা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজপণ্য বিক্রী করতে বাধ্য থাকতেন। অন্যথায় তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হত। এ ছাড়াও পণ্যাধ্যক্ষ রাজপণ্য বিক্রীর কাজে নিযুক্ত বেসরকারী বণিকদের উপর কর বসাবেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বেসরকারী বণিকদের কার্যকলাপ অনেকাংশেই রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হলে জিনিসের দাম ও বণিকের লাভের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরী। কৌটিল্যের বিধান অনুযায়ী পণ্যাধ্যক্ষ বণিকের লাভের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবেন। দেশীয় বণিকের জন্য শতকরা পাঁচ ভাগ ও বিদেশী বণিকের জন্য শতকরা দশ ভাগ লাভের হার ধার্য করা হয়। কিভাবে পণ্যের দাম ঠিক হবে, তা-ও অর্থশাস্ত্রে বলা আছে। পণ্যটি উৎপাদনের খরচ, উৎপাদনের এলাকা থেকে বাজারে আনার খরচ, ব্যবসায়ীর রাহা খরচ, ভারবাহী পশুর খাবারের খরচ, এইগুলি যোগ করে তার ওপর বণিকের নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ যুক্ত করে বাজারে পণ্যের দাম স্থির হত। কৌটিল্য পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে অতিরিক্ত লাভের আশায় ব্যবসায়ী পণ্যের দাম অতিরিক্ত চাইলে তার জরিমানা হবে, পণ্যও রাষ্ট্রের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি রাষ্ট্র হয়তো কিছুটা নরম নীতি গ্রহণ করেছিল। বিদেশী বণিকের লাভের হার দেশীয় বণিকের লাভের হারের দুই গুণ ; এছাড়া কৌটিল্য বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে আর্থিক বিষয়ে মামলা দায়ের করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সময় আমদানি বা রফতানি কিসে রাষ্ট্রের সুবিধা হয়, পণ্যাধ্যক্ষ তার বিচার করবেন। বৈদেশিক বাজার বোঝার জন্য পণ্যাধ্যক্ষকে বাণিজ্যিক দৌত্য প্রেরণ করতে বলা হয়েছে। এই জাতীয় বাণিজ্যিক দৌত্যের বাস্তব উদাহরণ মৌর্যযুগে জানা নেই। তবে অশোকের অনুশাসনে তাম্রপর্ণী বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যোগাযোগ ও পশ্চিম এশিয়ার পাঁচজন গ্রীক রাজার সঙ্গে অশোকের দৌত্যের কথা জানা যায়। এই দৌত্য 'ধম্ম'

Scanned with CamScanner

প্রচারের জন্য করা হয়েছিল। কিন্তু এই জাতীয় সাংস্কৃতিক দৌত্যকর্ম দূরপাল্লার যোগাযোগও বাণিজ্যিক লেনদেন না থাকলে বাস্তবায়িত হওয়া কঠিন। মৌর্য আমলে বাণিজ্যিক বিকাশের অন্যতম চাক্ষুষ প্রমাণ মুদ্রার ব্যাপক উপস্থিতি। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রার উদ্ভব ঘটেছিল ; এই মুদ্রা খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতকে মৌর্য ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল। এছাড়াও ছাঁচে ঢালা ('কাস্ট') মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌর্যকালীন মুদ্রায় শাসকের নাম ও পরিচয় লেখা নেই। তবে মুদ্রার ধাতব মান, ওজন ও বিশুদ্ধি এত নিয়মিত যে মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করা যায় না। সাধারণত যে মুদ্রাটিতে তোরণের উপর বসা ময়ূরের নকশা দেখা যায়, তাকে মৌর্য মুদ্রা বলে মনে করা হয়। উত্তর পশ্চিম ভারত, গাঙ্গেয় অববাহিকা, উত্তর বঙ্গ, মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশের নানা স্থান থেকে এই নকশা চিহ্নিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রাগুলির নির্দিষ্ট ওজন নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কোসাম্বী এক অভিনব পন্থায় মুদ্রাগুলির আদত ওজন নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মুদ্রার আকার ও আয়তনে ক্ষয় হয় ; কোনও নির্দিষ্ট সময়ে কি পরিমাণ ক্ষয় হচ্ছে জানা গেলে মুদ্রাটি বাজারে ছাড়ার সময় কি ওজনের ও আকারের ছিল তা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু রোমিলা থাপার মনে করেন যেহেতু এই মুদ্রাগুলির ধাতব মান ও ওজন ঠিক কতটা ছিল তা জানা দুষ্কর, তাই ক্ষয়ের পরিমাণ বোঝা কঠিন ও সেই কারণে কোসাম্বীর পদ্ধতি খুব কার্যকরী নয়। তবে অর্থশাস্ত্রে মুদ্রা প্রস্তুত করার অধিকার কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত ; যে রাজকর্মচারী মুদ্রা তৈরীর তদারকি করতেন তিনি 'রূপদর্শক' নামে অভিহিত।

॥ ৫ ॥

রাষ্ট্রীয় তদারকিতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে যে বিকাশ ঘটেছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে নগরায়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি অর্থনীতি থেকে পাওয়া উদ্বৃত্ত, উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করার মত প্রশাসনিক কাঠামো, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে নগরায়নের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। মৌর্য আমলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অর্থনৈতিক জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করায় উৎপাদনের বিভিন্ন খাত থেকে উদ্বৃত্ত আহরণ করা সম্ভব হয়েছিল। তার ফলে নগরায়নের গতি অব্যাহত ছিল। বুদ্ধের সমকালীন গাঙ্গেয় উপত্যকায় পাটলিপুত্র প্রথম সারির শহর হয়ে ওঠেনি ; কিন্তু খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে পাটলিপুত্র কেবলমাত্র ভারতীয় রাজনীতির পীঠস্থানই নয়, তা এক বিশাল নগরের আকার ধারণ করে। গ্রীক লেখকদের রচনায় এই নগরের বিশাল আয়তন ও নাগরিক জীবনযাত্রার উচ্চমান বিষয়ে মন্তব্য আছে। গ্রীক বিবরণীতে উল্লিখিত ছয়টি সমিতির দ্বারা নগর প্রশাসন চালাবার ঘটনা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই জাতীয় প্রশাসনিক কাঠামো পৌর সংগঠনকে মজবুত করেছিল। পাটলিপুত্র যে আন্তর্জাতিক মানের শহর হয়ে উঠেছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই শহরে

Scanned with CamScanner

মেগাস্থিনিসের মত বিদেশী নাগরিকদের উপস্থিতি। একটি প্রশাসনিক সমিতি যে এই নগরে বিদেশীদের তত্ত্বাবধান (অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও মৃত্যু ঘটলে আত্মীয় পরিজনকে খবর দেওয়া) করত, সে বিষয়ে মেগাস্থিনিসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। পাটনার কাছে বুলন্দিবাগে প্রাচীন পাটলিপুত্রের কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয় যে মেগাস্থিনিস এই শহরের যে বিশাল আকারের কথা বলেছিলেন (লম্বায় ৯০ স্টেডিয়া বা ৯$\frac{3}{8}$ মাইল ও চওড়ায় ১৫ স্টেডিয়া বা ১$\frac{3}{8}$ মাইল ; শহরের চারপাশে ছিল একটি পরিখা ও নগর প্রাকার ; নগর প্রাকারে বহু প্রবেশ পথ ও নজরদারির স্থান নির্দিষ্ট ছিল), তা নিতান্ত অমূলক নয়।

গাঙ্গেয় উপত্যকার অপর শহর কৌশাম্বীতে নগরায়ন অব্যাহত ছিল। কৌশাম্বীর উৎখনন থেকে একটি রাজপথের অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে যা সম্ভবতঃ ৩০০ খ্রীঃ পূঃ নাগাদ তৈরী হয়। এছাড়াও কৌশাম্বী থেকে পাওয়া গিয়েছে ভূগর্ভে প্রোথিত পোড়ামাটির বহু কলস, যেগুলি একটার উপর আর একটি সাজানো থাকত। এইগুলি শহরের জলনিকাশী ব্যবস্থার পরিচায়ক। কৌশাম্বীর মতই ভূগর্ভস্থ কলস দ্বারা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহার মৌর্য কালীন অনেকগুলি প্রত্নক্ষেত্রে দেখা যায়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে তক্ষশিলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ ভির ঢিবিতে উৎখনিত। এই প্রত্নক্ষেত্রে শহরের বাড়ীঘর (যা প্রস্তরনির্মিত) ও একটি রাস্তার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে তক্ষশিলাতে মৌর্য আমলে নগর প্রাকার দেখা যায় না। তক্ষশিলা মৌর্য আমলে উত্তর পশ্চিম দিকের প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র রূপে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। তক্ষশিলার নিকটস্থ অপর শহর ছিল পুষ্কলাবতী, যার পুরাতাত্ত্বিক পরিচয় চারসাদ্দায় উৎখনন করে জানা যায়। এই শহরেও মৌর্যকালীন নগর প্রাকার নেই। নগর প্রাকার অবশ্য **শ্রাবস্তী** নগরীতে বিরাজ করছিল। একটি নতুন নগর খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে : এই শহরটি যমুনার তীরে অবস্থিত মথুরা। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের পূর্বে মথুরা নগরী সম্বন্ধে আমাদের তথ্য সামান্যই; তাছাড়া অঙ্গুত্তর নিকায়তে (যেখানে বুদ্ধের সমকালীন উত্তর ভারতের অবস্থা অনুমান করা যায়) মথুরার প্রতি অবহেলাই প্রকট। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে সম্ভবত মৌর্য আমলে এই নগরীর চারপাশে প্রথম কাদামাটীর প্রাচীর তোলা হয়। অর্থশাস্ত্রে মথুরার বস্ত্রশিল্প প্রশংসিত হতে থাকে। মথুরার নিকটস্থ **সঙ্ঘ**-এ উৎখনন চালিয়ে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে মথুরার পুঁতিশিল্পের বিকাশও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। **সঙ্ঘ**-এ বাসগৃহের যে ভিত পাওয়া গিয়েছে তাতে গৃহনির্মাণের নকশা ও পরিকল্পনায় বৈচিত্র্যের আভাস দেখা যায়। এই ঘটনা মথুরা নগরীর বিকাশের দিকে ইঙ্গিত করে। মথুরাতে নগরায়ন যে দ্রুতগতিতে ঘটছিল তা পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ) সমর্থিত। পতঞ্জলির মতে মথুরার অধিবাসী সাঙ্কাশ্য ও পাটলিপুত্রের বাসিন্দাদের চেয়েও অধিকতর সংস্কৃতিবান ছিলেন ('সাঙ্কাশ্যকেভ্যশ্চ পাটলিপুত্রকেভ্যশ্চ মাথুরা অভিরূপতরা ইতি')।

Scanned with CamScanner

মৌর্য আমলেই সম্ভবত গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্ব প্রান্তে প্রাচীন বাংলায় নগরায়নের সূত্রপাত ঘটে। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে যে লেখ পাওয়া গিয়েছে তার সঠিক কাল জানা না থাকলেও লেখটির হরফ মৌর্যকালীন ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে তুলনীয়। ফলে লেখটি মৌর্যকালীন বলেই মনে হয়; এছাড়া এই লেখতে যে প্রশাসনিক সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায় তা মৌর্য আমলের বলেই মনে হয়। মহাস্থান লেখতে পুডনগল বা পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে যা সুমাত্রাযুক্ত বা সুবিন্যস্ত ও সমৃদ্ধিশালী বা সুলক্ষ্মীত বলে বর্ণিত ('সুমাতে সুলখিতে পুডনগলতে')। 'সুলখিত' এই প্রাকৃত শব্দটি যদি সংস্কৃত 'সুরক্ষিত' কথার সমার্থক হ। তাহলে লেখটির বর্ণনায় সম্ভবত পুণ্ড্রনগরের প্রাকারের ইঙ্গিত রয়েছে বলে বুঝতে হবে। এই পুণ্ড্রনগরে একটি রাজকীয় কোশ ও কোষ্ঠাগার ছিল। পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ মহাস্থান গড়ে আবিষ্কার করেছিলেন কাশীনাথ দীক্ষিত। এই প্রত্নক্ষেত্র থেকে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, মৌর্যকালীন পোড়ামাটীর মূর্তি, ছাঁচে ঢালা ও অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা, লৌহ উপকরণ ও আধাদামী পাথরের পুঁতি পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি পুণ্ড্রনগরের চারপাশে যে কাদামাটীর দেওয়াল তোলা হয়েছিল তারও সন্ধান মিলেছে। এই তথ্যগুলি অবিসংবাদিতভাবে পুণ্ড্রনগরের নগরসুলভ চরিত্রকে প্রকট করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে 'দুর্গনিবেশ' অধ্যায়ে (২·৪) নগরবিন্যাসের আদর্শ প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। কৌটিল্য দুর্গ বলতে শুধু কেল্লা বোঝাননি, তাঁর রচনায় দুর্গ কথাটি নগরের—বোধহয় রাজধানী-সমার্থক। তিনি নগরকে যেহেতু দুর্গ বলে অভিহিত করেন, অতএব বোঝা যায় যে নগরের চারপাশে প্রাকারের অস্তিত্ব মৌর্য আমলে সাধারণ ও নিয়মিত ঘটনা। দুর্গের বিভিন্ন অংশে কি ভাবে প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক ও বসবাসের অঞ্চল গড়ে উঠবে, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে তার বিধান আছে। 'নাগরিক প্রণিধি' অধ্যায়ে (২·৩৬) অর্থশাস্ত্রকার নগরের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ছক আলোচনা করেছেন। তবে নগরবিন্যাসের এই কৌটিলীয় ছক ও তত্ত্ব বাস্তবে কতগুলি সমকালীন নগরে দেখা যাবে, তা অবশ্য সন্দেহের বিষয়।

দ্বিতীয় দফায় নগরায়নের সূচনা যখন খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে দেখা গিয়েছিল, তখন তা ছিল প্রধানত মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী অবধি নগরায়নের গতি ছিল অব্যাহত। মৌর্যদের রাজনৈতিক প্রতাপ বৃদ্ধি ও বিশাল অঞ্চলের উপর অর্থনৈতিক উদ্যোগ শুরু হওয়ায় নগরায়নের প্রক্রিয়াটি সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হয়; দাক্ষিণাত্যে ও ওড়িষ্যাতে মৌর্য আধিপত্য প্রসারিত হওয়ার দরুন প্রশাসনিক কারণেই ঐ অঞ্চলেও নগরায়নের ঢেউ সম্ভবত পৌঁছেছিল।

॥ ৬ ॥

রাষ্ট্র নির্দেশিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষিশিল্প বাণিজ্যের বিকাশ, গ্রামীণ ও

Scanned with CamScanner

নগর এলাকার সমৃদ্ধি মৌর্যদের সামনে সম্পদ আহরণের ব্যাপক সুযোগ এনে দিয়েছিল। কর ব্যবস্থার দ্বারা সম্পদ সংগ্রহের প্রবণতা মৌর্য আমলে বিশেষভাবে প্রকট। ভারতীয় ইতিহাসে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা সম্পদ সংগ্রহের প্রয়াস এই আমলেই প্রথম দেখা যায়। সম্পদ সংগ্রহে সাফল্যই এই আমলে এক সমৃদ্ধ কোশের জন্ম দেয়, যে কোশ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের অতি সজাগ নজরের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

অর্থশাস্ত্রে কর ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের তত্ত্বাবধান ও সংগঠনের দায়িত্ব দুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজপুরুষের উপর অর্পিত : এই দুইজন সমাহর্তা (সম্যক রূপে সংগ্রহ করেন যিনি, অর্থাৎ মুখ্য কর সংগ্রাহক) ও সন্নিধাতা (মুখ্য হিসাব রক্ষক ও পরীক্ষক) বলে অর্থশাস্ত্রে অভিহিত। যে সাতটি সূত্র থেকে সমাহর্তা কর আহরণ করবেন, সেগুলি হল (১) দুর্গ, (২) রাষ্ট্র, (৩) খনি, (৪) সেতু, (৫) বন, (৬) ব্রজ ও (৭) বণিকপথ। যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনাধীন অর্থনীতির ভিত ও সম্পদের প্রধান আকরই ছিল কৃষিকর্ম, ফলে মৌর্য রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। এই আমলে ভূমি রাজস্বের হার কি ছিল তা জানার সরাসরি উপায় নেই। অশোক বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রামে গিয়ে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ঐ অঞ্চলে করভার হ্রাস করেছিলেন (রুম্মিনদেই স্তম্ভলেখ দ্রষ্টব্য)। অশোক ঐ গ্রামটিকে 'বলি' নামক কর থেকে পুরোপুরি রেহাই দিয়েছিলেন ও ভাগ বা উৎপন্ন ফসলের উপর রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ কমিয়ে $\frac{১}{৮}$ ভাগ করেছিলেন। $\frac{১}{৮}$ ভাগ যদি কমানোর পর ভূমিরাজস্বের হার হয়, তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় রাজস্বের হার বেশী হবারই কথা। প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে রাজা এক-ষষ্ঠাংশ 'ভাগ' পাবার অধিকারী বলে ধরা হয় ; মৌর্য আমলে রাজস্বের হার এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-চতুর্থাংশ হতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে রাজা 'ভাগ' পাবার অধিকারী, কারণ তিনি প্রজার জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখেন। অন্য দিকে 'বলি' বলতে বৈদিক সাহিত্যে কোনও কর বোধহয় বোঝাতো না ; তা ছিল প্রজাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উপঢৌকনের সমতুল্য। কিন্তু কালক্রমে রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটলে রাজা বলিপ্রদান বাধ্যতামূলক করেন ; ফলে 'বলি' কার্যত খাজনার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। 'সীতা' জমিতে নিযুক্ত কৃষিশ্রমিকদের কাছ থেকে রাষ্ট্র সম্ভবত দুইভাবে ভাগ আদায় করত আগেই বলা হয়েছে, সীতা জমি চাষ করার জন্য রাষ্ট্র কৃষককে কি পরিমাণ সহায়তা করছে তার ভিত্তিতে কোথাও ফসলের একচতুর্থাংশ ও আবার কোথাও পাঁচ ভাগের চার ভাগ রাজস্ব নেওয়া হত। কৃষির খাত থেকে রাষ্ট্র আরও এক প্রকার কর আদায় করত : এই কর অর্থশাস্ত্রে 'উদকভাগ' (বা জলকর) নামে আখ্যাত। কিভাবে সেচের জল নেওয়া হচ্ছে তার ওপর জলকরের হার কমবেশী হত। যন্ত্রের সাহায্যে নদী বা পুকুর থেকে জল সংগ্রহ করলে সর্বোচ্চ হারে ($\frac{১}{৩}$ অংশ) কর দিতে হত। সেচ ব্যবস্থা থেকে কর সংগ্রহের ধারণা খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকেই সম্ভবত প্রথম দেখা যায়। খনি থেকে রাষ্ট্র অন্তত বাইশ রকম 'আয়' বা কর পাবার অধিকারী বলে অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। অশোকের অনুশাসনে 'বচভূমিক মহামাত' নামক যে

Scanned with CamScanner

রাজকর্মচারীর নাম জানা যায়, তিনি সম্ভবত 'ব্রজ' বা গোচারণ ভূমির উপর কর আদায় করতেন। মেগাস্থিনিস জানিয়েছেন যে পশুপালক ও পেশাদারী শিকারীরা রাষ্ট্রকে কর দিত। এই জাতীয় কর সম্ভবত অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত 'ব্রজ' ও 'বন' খাতে সংগৃহীত হত। অরণ্য ও গোচারণ ভূমিকে রাজস্বের আওতায় আনার প্রথম প্রয়াসও সম্ভবত মৌর্য আমলেই দেখা যায়। বণিকপথের উপর 'শুল্ক', 'বর্তনী' জাতীয় কর ও চুঙ্গীকর আদায় করার বিধান অর্থশাস্ত্রে আছে। মৌর্য আমলের পূর্বে ভারতীয় ইতিহাসে এত বিভিন্ন সূত্র থেকে বহু পরিমাণ কর সংগ্রহের নিয়মিত ব্যবস্থা ও মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার নজীর জানা নেই। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র মানলে স্বীকার করতে হবে যে মৌর্য রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্যই ছিল বিভিন্ন সূত্র থেকে যত বেশী সম্ভব সম্পদ আহরণ করা।

এতক্ষণ মৌর্য রাজস্ব ব্যবস্থার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল, তা স্বাভাবিক সময় ও অবস্থায় কার্যকর ; কিন্তু রাষ্ট্রে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে সম্পদ সংগ্রহের ভিন্নতর পন্থাও অর্থশাস্ত্রে আলোচিত। কৌটিল্য রাজকোশের অর্থকৃচ্ছ্রতা সম্বন্ধে বিশেষ স্পর্শকাতর ছিলেন ; তাঁর মতে দুর্বল কোশ যুক্ত রাজা অচিরেই পুর ও জনপদবাসীকে গ্রাস করেন। তাই আর্থিক সঙ্কট এড়াতে জরুরী ভিত্তিতে কর সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আপৎকালীন কর ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে 'প্রণয়' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থা অনুসারে রাজা কৃষককে অতিরিক্ত ফসল ফলাতে বাধ্য করতে পারেন ; কৃষক, পশুপালক ও কারিগরদের (ব্যবসায়ী সহ) কাছ থেকে রাজস্বের স্বাভাবিক হারের তুলনায় বেশী কর আদায় করার অধিকার রাষ্ট্রের থাকে। গণিকাদের ওপরও অতিরিক্ত করভার চাপাবার সুপারিশ অর্থশাস্ত্রে আছে। যেহেতু এই ব্যবস্থায় প্রজার উপর আর্থিক চাপ আসা অবশ্যম্ভাবী, তাই কৌটিল্য নির্দেশ দেন যে কোনও রাজা তাঁর শাসনকালে যেন একবার মাত্রই এই করনীতি প্রয়োগ করেন (সকৃদেব, ন দ্বিঃ প্রযোজ্যঃ)। কিন্তু যদি আর্থিক অবস্থা এতটাই সঙ্কটজনক যে প্রণয়ক্রিয়া দ্বারাও যথেষ্ট সম্পদ সংগ্রহ করা যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে অর্থসংগ্রহের জন্য ছলে বলে কৌশলে যেন তেন প্রকারেণ সব পদক্ষেপই অর্থশাস্ত্রে অনুমোদিত। অর্থসংগ্রহের জন্য কৌটিল্য নীতি, বিবেক, যুক্তির ধার ধারেননি।

॥ ৭ ॥

মৌর্য আমলে উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও সম্পদ সংগ্রহে যে সংগঠিত প্রয়াস দেখা যায়, তার তুলনা মৌর্য আমলের আগে বা পরে আর চোখে পড়ে না। রাষ্ট্র কেবলমাত্র পরিদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়, রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ও ব্যবসায় বাণিজ্যে অংশ নিত। ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রায় একচেটিয়া আকার ধারণ করেছিল ; কোথাও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যক্তিগত উদ্যোগের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সক্রিয় ছিল। আবার কোথাও কোথাও রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অংশ না নিয়ে ব্যক্তিগত

Scanned with CamScanner

উদ্যোগকে মেনে নিত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। মৌর্য আমলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাতিল হয়ে গিয়েছিল, একথা মনে করার কারণ নেই ; কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গৌণ ছিল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ও নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে রাষ্ট্রের বিরামহীন তদারকি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। সেই কারণেই অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক বিশিষ্ট পর্ব রূপে এই যুগকে চিহ্নিত করা যায়।

অর্থনৈতিক জীবনে বহুমুখী কর্মধারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু তা জনজীবনের পক্ষে কতটা উপকারী হয়েছিল তা তর্কসাপেক্ষ। মৌর্য অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে হয়তো কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার নজীর আছে যাতে সামগ্রিক জনজীবনের উপকার হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থশাস্ত্রে ও অশোকের অনুশাসনে রাজাকে পিতার মত প্রজাপালন করার যে আদর্শ প্রচারিত হয়েছে তার থেকে রোমিলা থাপার সহ বহু ঐতিহাসিকই মনে করেন যে মৌর্যদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রজাকল্যাণের সহায়ক ছিল। এই মত মানা কঠিন। অর্থশাস্ত্রে ও অন্যান্য তথ্যসূত্রে উল্লিখিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার প্রত্যক্ষ ও প্রধান কারণ ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটানো ; প্রজাকল্যাণের কথা সেখানে থাকলেও তা নিতান্তই গৌণ ভূমিকায় বিরাজমান। বিশেষত প্রণয়ক্রিয়া দ্বারা সম্পদ সংগ্রহের বিধান দেখলে সন্দেহ থাকে না যে মৌর্য অর্থনীতির মধ্যে সাধারণ মানুষের কল্যাণচিন্তা বিশেষ স্থান পেত না। তদুপরি অর্থশাস্ত্রে যে গোয়েন্দাব্যস্থার ব্যাপকতা দেখা যায় তা-ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মৌর্য আমলে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ প্রধানত শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থেই ঘটেছিল ; রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে যত বেশী সম্ভব সম্পদ সংগ্রহের মৌর্য রাষ্ট্রের যে আগ্রহ ছিল, তার সমান অনুপাতে আগ্রহ সম্পদ বণ্টন ও বিতরণের ক্ষেত্রে দুর্লভ।

রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল প্রতাপ ও অবিসংবাদী কর্তৃত্ব সত্ত্বেও কি মৌর্য অর্থনীতি অন্তত তার অন্তিম পর্বে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছিল ? রোমিলা থাপার পরবর্তীকালে রচিত অবদানশতকের একটি কাহিনীতে এমনই এক সঙ্কটের আভাস দেখেছেন। এরই সঙ্গে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের একটি তথ্য (মহাভাষ্য খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগের রচনা) বিচার করা যায়। পতঞ্জলি জানিয়েছেন হিরণ্যপ্রত্যাশী মৌর্যদের দ্বারা দেবদেবীর মূর্তি প্রস্তুত করানো হয়েছিল ('হিরণ্যার্থিভিঃ মৌর্যৈঃ অর্চ্চা প্রকল্পিতা')। এই বক্তব্যটি অর্থশাস্ত্রের নিরিখে বুঝতে হবে। কৌটিল্যের মতে আর্থিক দুরবস্থা কাটাতে রাজা ছলের আশ্রয় নিয়ে রুষ্ট দেবতার কাহিনী প্রচার করবেন ; দেবমূর্তি নির্মাণ করিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য বহু দানধ্যান করতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করবেন। দান হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ পরে অবশ্যই রাজকোশে জমা পড়বে। পতঞ্জলির উক্তির মধ্যেও এই বিধিবহির্ভূত পদক্ষেপের ইঙ্গিত রয়েছে, যা আর্থিক দুর্গতির সাক্ষ্য বহন করে। আর্থিক দুর্গতির সম্ভাব্য কারণ অনুমান করা যেতে পারে, যদিও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। অশোকের আমলে 'ধম্ম' প্রচারের

Scanned with CamScanner

জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছিল এতে সন্দেহ নেই ; এই ব্যয়ের পিছনে উচ্চ আদর্শ কাজ করলেও তা পরবর্তী পর্যায়ে সম্পদ সৃষ্টির পথ তৈরী করে দেয়নি ; ফলে ঐ জাতীয় ধর্মপ্রচারের ব্যয় কার্যত বোঝা হয়ে দাড়ায়। মৌর্য আমলে কৃষি অর্থনীতির তকাতীত উন্নতি ঘটলেও তার সামনে অন্যতম সমস্যা ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জৈন সাহিত্যে (যদিও তা পরবর্তী আমলের তথ্য) বলা হয়েছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বের শেষ পর্বে বারো বছর ব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। মহাস্থান লেখতে আপৎকালীন অবস্থার উদ্ভবের ফলে উত্তরবঙ্গে ত্রাণকার্য চালাবার নজীর দেখা যায়। মহাস্থান লেখতে যে আপদের উল্লেখ আছে তা সম্ভবত খরা (সুঅ=শুষ্ক অবশ্য 'সুঅ' কথাটি দীনেশচন্দ্র সরকার 'শুক' বা পাখী অর্থে গ্রহণ করতে চান ; শব্দতত্ত্ব দ্বারাও তা সমর্থিত। তবে পাখীর অত্যাচারে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে দুর্ভিক্ষের মত এক বড় মাপের বিপদ ঘটল, এতে খানিকটা কষ্টকল্পনা রয়ে যায়।) জনিত পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। সেই দিক দিয়ে উত্তরবঙ্গে খরা ও দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। এই জাতীয় আপৎকালীন জরুরী অবস্থা ('অত্যায়িক') সামাল দেবার জন্য কৌটিল্য সংগৃহীত সম্পদের অর্ধাংশই জমিয়ে রাখার বিধান দিয়েছেন। এই বিধান যদি মৌর্য আমলে প্রযুক্ত হয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে, বিপুল পরিমাণ সম্পদ সংগৃহীত হলেও তার এক বিরাট অংশই অব্যবহৃত অবস্থায় জমিয়ে রাখার প্রবণতা মৌর্য অর্থনীতিতে ছিল। এই সম্পদ উৎপাদন বা ভিন্নতর সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োগ করলে আর্থিক উন্নয়ন নিঃসন্দেহে ব্যাপকতর হত। যেহেতু সংগৃহীত সম্পদের কিছু অংশ নিছক জমিয়ে রাখা হত তাই প্রশাসনিক খরচ মেটাবার জন্য বোধহয় আরও বেশী পরিমাণ রাজস্ব যোগাড় করতে হত। তার ফলে অর্থনীতির উপর ও প্রজাপুঞ্জের উপর চাপ বাড়ার আশঙ্কা অস্বীকার করা যায় না। এই জাতীয় উভয় সংকট সম্ভবত মৌর্য আমলের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী জীবনীশক্তি দিতে পারেনি।

Scanned with CamScanner